১১-০৮-২০১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছো যে, তোমরা তোমাদের যোগবলের দ্বারা এই ভারত-ভূমিকেই স্বর্গে পরিণত করবে। যেখানে একটি মাত্র ধর্ম এবং একটি মাত্র রাজত্ব থাকবে।"

প্রশ্ন :- মায়ার এমন কোন বিঘ্নের হাত থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখতে পারলে, চমৎকার কিছু করে দেখানো যায় ?

উত্তর :- মায়ার সবচাইতে বড় বিঘ্ন হলো - দেহ-অভিমান জাগ্রত করিয়ে একে অপরের নাম-রূপের মোহজালে জড়িয়ে রাখে। কিন্তু যারা মায়ার প্রবঞ্চনার বিঘ্ন থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে পারে, সে অনেক কিছুই দক্ষতা দেখাতে পারে। তার মন-বুদ্ধিতেও সেবা-কার্যের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন পরিকল্পনা আসতে থাকে। আর এই সেবা-কার্য তখনই উন্নতমানের হয়, যখন সে দেহী-অভিমানী স্থিতিতে থাকতে পারে।

ওঁম্ শান্তি ! বাবা ধরায় অবতরণ করেছেন - রুহানী (ঈশ্বরীয়) বাচ্চাদের ওঁনার শ্রীমত জানাতে। বাচ্চারা তো অবগত আছেই যে, অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী আর অল্প কিছু কালের মধ্যেই যুগ পরিবর্তনের সব কার্য্যই সম্পূর্ণ হতেই হবে। এই রাবণ-পুরীই তখন বিষ্ণু -পুরীতে পরিবর্ত্তিত হবে। নিরাকার বাবা স্বয়ং যেমন গুপ্ত - ওঁনার শিক্ষা পদ্ধতিও তেমনি গুপ্ত। যদিও এখন প্রচুর সংখ্যাতেই সেন্টার এবং পাঠশালা আছে। ছোট বা বড়, গ্রাম বা শহরে, সেন্টার তো সর্বত্রই আছে। সেগুলিতে বহু বাচ্চাদেরও সমাগম হয়। এরপর দিন-প্রতিদিন তারও বৃদ্ধি হতে থাকবে। পুঁথি-পত্রে, গল্পে-সাহিত্যেও একথা লেখা আছে যে, আমরা এই ভারত-ভূমিতেই স্বর্গের রচনা করবো। তাই তো এই ভারত-ভূমি তোমাদের এত ভাল লাগে, যেহেতু তোমাদের স্মৃতিতে তা সুপ্ত অবস্থায় আছে , এই ভারত-ভূমিই একদা স্বর্গ-রাজ্য ছিল। যা ৫ হাজার বছর পূর্বে ঘটেছিল। তখন, ভারত খুবই উন্নত ও প্রতিপত্তিশালী রাজ্য-ভূমি ছিল। আর এ সব কথা কেবল তোমরাই জানো- যারা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী বাচ্চা হয়েছো। শ্রীমত অনুসারে চলেই, এই ভারত-ভূমিতেই আবার স্বর্গরাজ্য স্থাপন করতে হবে। আর সবাইকেই সে দিশা জানাতে হবে- তবে এ জন্য কিন্তু কারও সাথেই কোনও প্রকারের মত পার্থক্যে যাবে না। নিজেদের মধ্যেই তা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে - কোন্ কোন্ চিত্রে কি কি বিজ্ঞাপন দেবে সংবাদ-পত্রে। বাবার শ্রীমতের বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে চর্চা করবে। যেমনটি সরকারের আধিকারীকেরা করে থাকে। আর তার পরেই তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন - কিভাবে ভারতের উন্নতি করা যায়। যেহেতু ভারত-ভূমিতে এত মতভেদ, তাই তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে তা ঠিক করে, কি করে এখানে সুখ-শান্তি স্থাপন করা যায়। ঠিক সেই প্রকারের তোমরা বাচ্চারা তো রুহানী পাণ্ডব সরকার। যা এত বিশাল ঈশ্বরীয় পরিবার সরকার। পতিত পাবন বাবাই পতিত বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানিয়ে, পবিত্র দুনিয়ার রাজ্য-অধিকারীর উপযুক্ত বানান। আর এই রহস্যটা কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো। ভারতের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই-- প্রধান ধর্ম। যা স্থাপিত হয়, রুদ্র-জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা। শিববাবাকেই রুদ্র বলা হয়। এই বাবা এসেই তোমাদের চেতনাকে সজাগ করেছেন। তোমদেরও সেরূপে অন্যদেরকে সজাগ করতে হবে। যা অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারে, তোমরা অবশ্য তাই করে থাকো। এ

পর্য্যন্ত যারা যারা যে প্রকারের যতটা পুরুষার্থ করেছো, কল্প পূর্বেও তোমরা ঠিক ততটাই করেছিলে। এটা একটা রুহানী অলৌকিক লড়াই। কখনও মায়ার প্রবঞ্চনার বল বেশী তো কখনও ঈশ্বরীয় শক্তির ! সেবাকার্য কখনও বেশ জোর কদমেই চলতে থাকে - আবার কখনও বা কারও কারও ক্ষেত্রে মায়ার বিঘ্ন পড়ে। তখন মায়া তাকে একেবারেই জ্ঞান-শূন্য করে ছাড়ে। যেহেতু এটা এক প্রকারের যুদ্ধক্ষেত্র। মায়া তখন রামের (শিবের) সন্তানদের অজ্ঞান বানিয়ে রাখে। ঠিক যেন লব-কুশের গল্পের মতন ! সেখানে রামের দুটি পুত্র বলা হয়েছে। কিন্তু, এখানে তো বাবার কত বাচ্চা ! বর্তমানে সকল মনুষ্যই কুম্ভকর্ণের মতন গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। তাই তারা এটাও জানতে পারে না যে, পরমপিতা পরমাত্মা (বাবা) এই ধরাতেই অবতরণ করেছেন, তাঁর বাচ্চাদেরকে বিশ্ব-রাজ্যের অধিকার (বর্সা) দেবার উদ্দেশ্যে। বাবা ভারত-ভূমিতেই অবতরণ করেন। এই কথাটাও একেবারে ভুলে বসে আছে। এই ভারত-বাসীরাই একদা সেই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী ছিল- এতে কোনও সন্দেহই নেই। পরম পিতা পরমাত্মার (শিবের) জন্মও (অবতরণ) এখানেই হয়-তাই তো শিব-জয়ন্তী অনুষ্ঠানও ভারতেই পালন করা হয়। উঁনি অবতারিত হয়ে, অবশ্যই ওঁনার কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় এখানেই করে থাকবেন। বুদ্ধিতে তো এটাই আসে যে, বাবা এসে অবশ্যই স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করেন। প্রেরণার দ্বারা তো আর স্থাপনা কার্য সম্ভব নয়। তোমরা , বাচ্চাদেরকে এখানে রাজযোগ শেখানো হয়ে থাকে। স্মরণের যাত্রা কিভাবে করতে হয়, তাও শেখানো হয়। প্রেরণা তো হয় নিঃশব্দে। অনেকেরই ধারণা যে, শংকর (সূক্ষ্ম-লোকের দেবতা) প্রেরণার দ্বারা বিনাশ কার্য করিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে প্রেরণার দ্বারা তা সম্ভব নয়। তোমরা তো জানোই- অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী, নাটকে ওনার কর্ম-কর্তব্য মিসাইল তৈরীতে সাহায্য করা। যা বিনাশের উদ্দেশ্যেই বানানো হয়। আর প্রেরণা শব্দটি শাস্ত্রে ব্যাবহৃত শব্দ। বিনাশের ক্ষেত্রে প্রেরণার প্রসঙ্গই নেই। আবার শংকর-ও তো সূক্ষ্ম-লোকের বাসিন্দা। এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী, বিনাশ তো অবশ্যই হতে হবে। মহাভারতেও তা বলা হয়েছে, সেই যুদ্ধেও মিশাইল ইত্যাদি অস্ত্রের ব্যাবহার হয়েছিল। আর যা একবার ঘটে গেছে, তার পুনরাবৃত্তি আবারও হতে হবে। তোমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছো যে, যোগবলের দ্বারা তোমরাই এখানে স্বর্গের স্থাপনা করবে, যেখানে একটাই মাত্র ধর্ম থাকবে। আচ্ছা, তবে অন্য সব ধর্মগুলির কি হবে ? সেগুলির বিনাশ তো হতেই হবে। এ তো সহজ সমীকরণ। এ তো বলাই হয়, ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণুর দ্বারা পালনা- তা সম্পূর্ণই সঠিক। কিন্তু শংকরকে শিবের সাথে গুলিয়ে দিয়েছে- যা একেবারেই ভুল তথ্য। তাকে আবার শিব-শংকরও বলা হয়। যেহেতু, শংকরের তো কোনও কর্ম-কর্তব্যের পাঠ নেই, তাই শিবের নামের সাথে তাকে যোগ করে দেখানো হয়েছে। অথচ, শিববাবা নিজেই বলেন, ওনাকে তো কত কিছুই কর্ম-কর্তব্য করতে হয়। সবাইকে পবিত্র বানাতে হয়। ওঁনাকে ব্রহ্মার শরীরের আধার নিয়ে, এই সাকার দুনিয়ার স্থাপনা কার্য করাতে হয়। এই কার্যে শংকরের কোনও ভূমিকাই নেই। তাই তো কেবল শিবেরই পূজা হয়ে থাকে। শিববাবাই একমাত্র কল্যাণকারী যিনি সবাইকেই সব কিছু প্রাপ্তি করান। তাই তো বলা হয় শিব-পরমাত্মায়ে নমঃ। আর ব্রহ্মা হন প্রজাদের পিতা অর্থাৎ প্রজাপিতা। এই ব্রহ্মাই পরে বিষ্ণুরূপে প্রকাশ পান। আবার সেই বিষ্ণুকেই পরে ব্রহ্মা রূপে আসতে হয়-যা খুবই গুপ্ত রহস্যে ঘেরা। যা কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো। বিচক্ষণ সচেতন বাচ্চারাই বুদ্ধির দ্বারা এই জ্ঞানকে মূহুর্তেই বুঝতে পারে। সাধারণ মনুষ্যদের তো একথা বোধেই আসে না যে, পতিত-পাবন বাবা কোন সময়ে আসে। বর্তমান সময়কালটা তো কলিযুগের অন্তকাল। কিন্তু যদি বলা যায় যে, কলিযুগের আয়ুকাল আরও ৪০ হাজার বছর বাকী আছে- সে হিসেবে তো পতিতদের সংখ্যাটা আরও কত গুন বেড়ে যাবে। দুঃখের মাত্রাও কত গুন বেড়ে যাবে-যা সহনও করতে হবে। যেহেতু কলিযুগে তো আর সুখ পাওয়া যায়

না। এ সব কিছু না জানার কারণেই, বিচার শক্তিটাই ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তোমাদের বাচ্চাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে যুগ্ম সিদ্ধান্তে আসা উচিত কি প্রকারে এই ঈশ্বরীয় সেবার বিস্তার বাড়ানো যায়। বাবা তো নানা পরিকল্পনা জানাতেই থাকেন, কিন্তু তোমাদের মধ্যেও তার সমন্বয় দরকার। চিত্রগুলির বিষয়কে খুব ভাল করে বোঝাতে হবে। অবিনাশী নাটকের সময় অনুসারে ধীরে ধীরে চিত্রও পরিবর্তন হতে থাকছে। বাচ্চাদের তো তা জানাই আছে, যেমন যেমন সময় অতিবাহিত হচ্ছে, নাটকের পট-ও হুবহু সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। আর তার পরিপ্রেক্ষিতেই বাচ্চাদেরও অবস্থা কখনও ভালো, কখনও মন্দ হয়ে পড়ছে। অবশ্য এরকম তো হয়েই থাকে। বাবাও সাক্ষী-স্বরূপে তা দেখতে থাকেন। বাচ্চাদের উপর গ্রহের প্রকোপ হলে তা সমাধানের চেষ্টাও করে থাকেন বাবা। সেই কারণেই (ব্রহ্মা) বাবা বার বার বলতে থাকেন, শিববাবাকে স্মরন করতে থাকো। কিন্তু যখন বাচ্চারা দেহ-অভিমান স্থিতিতে এসে পড়ে, তখন বার বার ঠোকর খেতে হয়। সেই সময়কালে দেহী-অভিমানী স্থিতিতে থাকা উচিত। কিন্তু, বেশীর ভাগ বাচ্চাদের মধ্যে দেহ-অভিমান ভাবের লক্ষণ প্রবল। আর যখন তোমরা দেহী-অভিমানী ভাবে থাকতে পারবে, তখন সহজেই বাবাকে স্মরন করতে পারবে। ফলে ঈশ্বরীয় সেবারও উন্নতি হতে থাকবে। ভালো পদের অধিকারী হতে গেলে সর্বদাই এই ঈশ্বরীয় সেবায় নিয়োজিত হতে হবে। ভাগ্যে যদি তা না থাকে তো প্রচেষ্টার আগ্রহও আসে না। তখন তারা নিজেরা হতাশ হয়ে বলে যে, বাবা আমার তো ধারণারই অভাব রয়েছে-তাই সঠিক ভাবে বুদ্ধিতেও তা টেকে না। আর ধারণা না থাকলে তো খুশীও আসে না সেভাবে। যে ধারণাকে ধারণ করতে পারে- একমাত্র সে খুশীতে থাকতে পারে। তারা এও বুঝতে সক্ষম হয়, শিব বাবা ধরায় অবতরণ করেছেন। বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন - তোমরা খুব সুন্দর রীতিতে বুঝে নিয়ে, সেগুলি অন্যদেরকে সেভাবে বোঝাও। অনেকে এই ঈশ্বরীয় সেবায় নিমগ্ন হয়ে যায়- যা তাদের পুরুষার্থ হতে থাকে। তোমরা বাচ্চারা তো জানোই কি, প্রতিটা সেকেন্ড মুহূর্তই সে ভাবেই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, ঠিক যেমনটি অবিনাশী নাটকের চিত্রপটে খোদিত আছে। বাচ্চাদেরকে এটাও বোঝানো আছে যে, বাইরে কোথাও ভাষণ করার সময়, সেখানে অনেক প্রকারের লোকজনই তো আসে। তোমরা তো জানই, অন্যেরা সবাই তো বেদ, শাস্ত্র, গীতা, ইত্যাদির উপরেই ভাষণ করে থাকে, তাদের ধারণায় তো এটাই নেই যে, স্বয়ং ঈশ্বর নিজের ও তাঁর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যগুলিকে জানিয়ে থাকেন। চিত্রেও সেগুলিকেই কত সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা রয়েছে- পরমাত্মা কে। এইসব কথাগুলিকে তো আর প্রোজেক্টরের দ্বারা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রদর্শনীগুলিতে চিত্রগুলির সামনে দাঁড়িয়ে, তাদেরকে বুঝিয়ে, তারপর জিজ্ঞাসা করতে পারো- এবার বলো তো গীতার ভগবান কে ? কে এই জ্ঞানের সাগর ? আর কে বা পবিত্রতা, সুখ-শান্তির সাগর, আর মুক্তিদাতা ও পথ প্রদর্শকের দিশাই বা কে দেখান ? তারা তখন কৃষ্ণের নাম বলার যুক্তি আর খুঁজে পাবে না। যেহেতু পরমাত্মার মহিমা, গুণ ও কর্তব্যই ভিন্ন প্রকারের। প্রথমে এই (পয়েন্ট) সূত্রগুলিকে কাগজে লিখে প্রমাণ স্বরূপ তাদের হস্তাক্ষরও নিয়ে রাখা উচিত। পাখীরা যেমন নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করে - বর্তমান সময়ে সম্পূর্ণ দুনিয়াতেই সেরূপ চলছে। একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করেই চলেছে। মানুষের বেলায় যেমন ৫ বিকারের কথা বলা হয়, পশু-পক্ষীদের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটি বলা যায় না। অথচ ...। পবিত্র উন্নত দুনিয়া আর অপবিত্র অনুন্নত দুনিয়া - সে তো মনুষ্যদের জন্যই। যেমন কলিযুগ আসুরী সম্প্রদায়ের আর সত্যযুগ দৈবী সম্প্রদায়ের। বর্তমানের মনুষ্যরা এতই তমোপ্রধান বুদ্ধির হয়ে পড়েছে যে, তারা নিজেরাই বুঝতে পারছে না যে, তাদের স্বভাব-সংস্কার আসুরী সম্প্রদায়েরই হয়ে গেছে। তাই তো দেবতাদের সামনে গিয়ে প্রার্থণার সুরে বলতে থাকে - 'আমি এত নীচ পাপিষ্ঠ যে আমার কোনও গুনই নেই।' তোমরাই তাদেরকে তা

বুঝিয়ে প্রমাণ করে দেখাতে পারো। ৮৪ জন্মের উত্থান-পতনের সিঁড়ির চিত্রে তা খুব সুন্দর সহজ-সরল ভাবেই বর্ণিত আছে। উত্থান ও পতনের কারণকেও বিশ্লেষণ করা আছে। এই সিঁড়ির চিত্রই ভারত-বাসীদের জন্য মুখ্য চিত্র। সবচাইতে সুন্দর পন্থা। এই চিত্রের দ্বারাই খুব সুন্দর ভাবে বোঝাতে পারবে। ৮৪তম জন্ম সম্পূর্ণ করে আবার প্রথম রূপের জন্মে আসতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে পতন হতে হতে আবার উত্থানের অবস্থায় আসতে হবে। প্রত্যেকেরই ভাবনায় এটা থাকা উচিত যে, সবাইকেই সেই উত্থানের দিশা কি ভাবে বোঝানো যায়। এ সব চিন্তাধারা মনে না রাখলে, ঈশ্বরীয় সেবা হবে কি করে। চিত্র দিয়ে বোঝানোটা তো যথেষ্টই সহজ পন্থা। সত্যযুগের পরেই ধীরে ধীরে পতনের শুরু। (আত্মারা) বাচ্চারাও তখন বুঝতে পারে যে, এবার তাদের স্বভাব-সংস্কারেরও পরিবর্তন হচ্ছে। অর্থাৎ অন্যযুগে প্রবেশ করছে তারা। একধাপেই কেউ সত্যযুগে পৌঁছতে পারে না। প্রথমে তো শান্তিধামে যেতেই হয়। তোমাদের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় তো করতেই হয়। আর যে নিজের কর্ম-কর্তব্যের বিষয়টা ভালরূপে বুঝে এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে তা সঠিক ভাবে করতে পারে, সেই অনুপাতেই সে তার ক্রমিক নম্বর প্রাপ্ত করে। জাগতিক দুনিয়ার অন্যেরা এভাবে কেউ বলতেই পারে না যে, আমরা এই অবিনাশী নাটকে অভিনয় করি মাত্র। অথচ আমরা (বি.কে.-রা) তা লিখেও দিতে পারি, প্রত্যেকটি মানুষ মাত্রই এই অসীমের নাটকের অভিনয়কারী। যার মধ্যে প্রধান নায়ক, নির্দেশক, পরিচালককে আর নাটকের আদি-মধ্য-অন্তের ঘটনাবলী যে জানতে চায় না, সে তো অবুঝই থাকবে। এ সব লিখিত আকারে দিলেও, তাতে কোনও অসুবিধা নেই। এক কানে শুনে অপর কান দিয়ে বের করে দেওয়া উচিত নয় মোটেই। ঈশ্বরীয় সেবা, সেবা আর সেবা। এমনটা হলে, তার ফলে কোনও প্রকার গ্রহের প্রকোপই পড়তে পারে না। বাবা তো জানেনই, বচ্চাদের উপর গ্রহের প্রকোপ কখনও না কখনও পড়েই থাকে - তখন তাদের কত লোকসানও হয়। ধনী ব্যবসায়ীও হত দরিদ্রে পরিণত হয়। অবশ্য তার পেছনে কারণও থাকে কিছু না কিছু। অনেককে বাবা আবার বুঝিয়েও থাকেন, যাতে তারা কখনও নাম-রূপের আধারে ফেঁসে না যায়। না হলে মায়া এমন ভাবে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে থাকবে, ফলে গাড্ডায় পড়ে হাবুডুবুই খেতে হবে। মায়া খুবই প্রবঞ্চক। সে কখনও কারওকে ভালবাসতে পারে না। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম কখনও বিকারের রূপ নিতে পারে না। একে অপরের নাম-রূপে মুগ্ধ হয় না। তোমরা তো দেখেও থাকবে, সেন্টারেও এরূপ মায়ার বিঘ্ন পড়ে কদাপি কখনও। তারা একে অপরের নাম-রূপেই ফেঁসে যায়। মায়া আবার এমনও করে, মাতা- সে নিজেরই নাম-রূপে, কন্যা - সে নিজেরই নাম-রূপে (অহংকারে) ফেঁসে যায়। এমন কি যারা পুরুষার্থ করতে থাকে, তাদেরকেও মায়া তার প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে দেয় না। এই জন্যই বাবা সাবধানী বাণী শোনান -বাচ্চারা, মায়া তোমাদের নানা ভাবেই ফাঁসাতে চেষ্টা করবে, কিন্তু তোমরা যেন ওর জালে ফেঁসে যেও না। দেহ-অভিমানে আসা মোটেই উচিত নয়। নিজেকে আত্মা স্বরূপ স্থিতিতে রেখে বাবার স্মরণেই থাকবে। তবেই মায়ার প্রবঞ্চনা থেকে বাঁচতে পারবে। তোমাদেরকে বাবা ফুলের মতন সুন্দর সর্বগুণের বানাতেই এসেছেন। অতএব কোনও বিষয়েই বাবার প্রতি সংশয় আসা উচিত নয়। কিন্তু তবুও যদি সংশয় আসে, তখন তো ঈশ্বরীয় সেবা সঠিক ভাবে করতেই পারবে না। নিজে নিজেই ঢোঁক গিলতে থাকবে। তাই এতে সাহস রাখতে হবে। এদিকে হাতে সময়ও খুব কম। বাবার মুরলী শুনলেই আবার স্ফূর্তি-উৎসাহেরও জোগান হবে মনে। আত্মপ্রকাশ বাচ্চা সঠিক রীতিতেই চিত্রগুলির প্রতি মনোনিবেশ করেছে। বোম্বেতে যারা আছে, তাদেরও তা ভাবনা-চিন্তা করা উচিত। প্রধান চিত্রটা প্রথমে বানাতে হবে। তারপর তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে, সময় অনুসারে বাবাও নির্দেশ দিতে থাকেন, কি ভাবে চিত্রেউত্কর্ষতা বৃদ্ধি পেতে পারে। এরকম কোনও যুক্তি বের করো সিঁড়ির (৮৪ জন্মের উত্থান-পতনের ধারা) চিত্রকে বিমান-বন্দরে

রাখা যায়। যা দেখে সবাই খুশী হবে। তখন তারাও ভাববে, এই যুক্তিগুলিকে তো খণ্ডন কেউ-ই করতে পারবে না। বাচ্চারাও খুব উৎসাহ বোধ করবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি (সিকীলধে) হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের সুমন ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবার নমস্কার ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের প্রতি।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) তোমরা বাচ্চারা এখন জীবন-যুদ্ধের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে, মায়া আর রাবণের সাথে যুদ্ধ চলছে তোমাদের। এই মায়াই তোমাদের বিঘ্ন সৃষ্টিকারী । তাই নিজেদেরকে খুব সাবধানে রাখতে হবে।

২) প্রত্যেককে নিজেই নিজের উন্নতির কথা ভাবতে হবে। চিত্রে যে রকম বোঝানো আছে, ঈশ্বরীয় সেবা সে ভাবেই বাড়াতে হবে। আর চিন্তন করতে হবে, চিত্রে আর কি দেখানো যেতে পারে, যাতে মনুষ্যরা আরও সহজেই তা বুঝতে পারে।

বরদান :- বুদ্ধিযোগের প্রেম এক ও একমাত্র প্রেমিকের সাথে নিবিষ্ট হয়ে সর্বদাই সে নিকটে, এই অনুভূতির বিজয়ী রত্ন হও।

প্রীত বুদ্ধি অর্থাৎ বুদ্ধিযোগে এক ও একমাত্র প্রেমিকের সাথেই মগ্ন হয়ে থাকতে হবে। যার এই একের সাথে প্রেম হয়ে যায়, তার আর অন্য কোনও ব্যাক্তি বা বৈভবের সাথে প্রেম হতেই পারে না। সে সদা বাপদাদাকেই নিজের সামনে অনুভব করতে থাকবে। তার মনে শ্রীমতের বিপরীত ব্যর্থ সংকল্প বা বিকল্প কোনও কিছু আসতেই পারে না। তার মুখ থেকে ও মন থেকে সর্বদা এ কথাই বেরোবে- তোমার সাথেই খাই, তোমার সাথেই বসি ..... তোমার সাথেই সর্ব সম্বন্ধ পালন করি ..... এই ধরণেরই সর্বদা প্রীত বুদ্ধি ধারণ করতে পারলে সে বিজয়ী রত্ন হতে পারে।

স্লোগান :- চাই, চাই, আরও চাই - তা সংকল্পে আসা মানেই, রাজকীয় ভাবের প্রত্যাশা।